রাধারাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

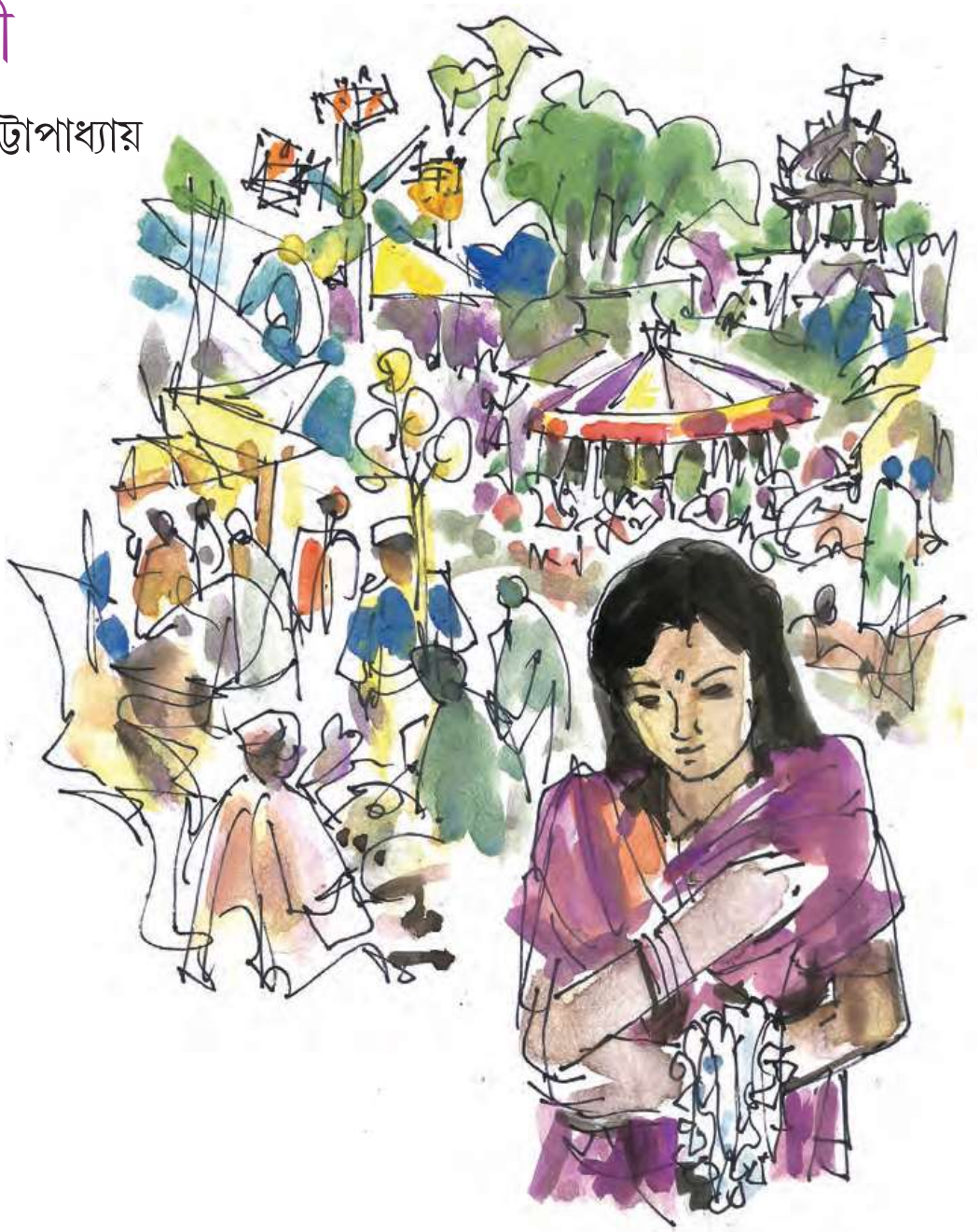

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভালো ছিল—বড়োমানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়; সর্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রিদার জ্ঞাতি ডিক্রি জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রিদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা, অলংকারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবি কৌন্সিলে একটি আপিল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটিরে

আশ্রয় লইয়া কোনো প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্‌ণা, এ জন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কী দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই-একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতেই বড়ো বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোকসকল ভাঙিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড়ো অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার —পথ কর্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষু বারিবর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলি বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমতো সময় অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, 'কে গা তুমি কাঁদ?'

পুরুষ মানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে কিন্তু বড়ো দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, 'আমি দুঃখীলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।'

সে পুরুষ বলিল, 'তুমি কোথা গিয়াছিলে?'

রা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ি যাইব। অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

রাধারাণী বলিল, 'শ্রীরামপুর।'

সে ব্যক্তি বলিল, 'আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চলো, কোন পাড়ায় তোমার বাড়ি—তাহা আমাকে বলিয়া দিয়ো—আমি তোমাকে বাড়ি রাখিয়া আসিতেছি। বড়ো পিছল, তুমি আমার হাত ধরো, নহিলে পড়িয়া যাইবে!'

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড়ো বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড়ো বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, 'তোমার বয়স কত?'

রা। দশ-এগারো বছর—

'তোমার নাম কী?'

রা। রাধারাণী।

'হাঁ রাধারাণী! তুমি ছেলেমানুষ, একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন?'

তখন সে কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, 'আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়িতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচো তো আমি কিনি।'

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ি লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কী প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী, মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, 'ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও!' সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, ''এ কি পয়সা? এ যে বড়ো বড়ো ঠেকচে।''

'ডবল পয়সা—দেখিতেছ না দুইটা বই দিই নাই।'

রা। তা এ যে অন্ধকারেও চকচক করচে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই তো?'

'না। নূতন কলের পয়সা, তাই চকচক করচে।'

রা। তা, আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া, রাধারাণী বলিল, 'তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কী পয়সা।'

সঙ্গী বলিল, 'আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ো।'

রাধারাণী বলিল, 'আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিয়া দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।'

'আচ্ছা।'

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চকমকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া তল্লাশ করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণবদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—'মা! এখন কী হবে?'

মা বলিল, 'কী হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারি হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।'

তাহারা এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছিল, এমতো সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটিরের আগড় ঠেলিয়া বড়ো শোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ারমুখো, কাপুড়ে মিন্‌সে!

রাধারাণীর মার কুটির বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটিরের নিকটেই পদ্মলোচন সাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে—একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল, 'রাধারাণীর এই কাপড়।'

রাধারাণী বলিল, 'ওমা! আমার কীসের কাপড়!' পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কিনা, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; বলিল, 'কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ওই রাধারাণীকে দিয়া এসো।'

রাধারাণী তখন বলিল, 'ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁ গা পদ্মলোচন?'—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেকবারই ইহাদিগের নিকট যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বারো আনা, আর দুই আনা মুনাফা লইতেন।

'হাঁ পদ্মলোচন—বলি সেই বাবুটিকে চেন?'

পদ্মলোচন বলিল, 'তোমরা চেন না?'

রা। না।

প। আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

যাহা হউক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনাফা আট টাকা সাড়ে চোদ্দো আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙাইয়া মায়ের পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—'এ কী মা!'

মা দেখিয়া বলিলেন, 'একখানা নোট!'

রাধারাণী বলিল, 'তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।'

মা বলিলেন, 'হাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখো, তোমার নাম লেখা আছে।'

রাধারাণী বড়োঘরের মেয়ে, একটু অক্ষরপরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, 'হাঁ মা, এমন লোক কে মা!'

মা বলিলেন, 'তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।'

পরদিন মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্তী কোনো স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোনো সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

(নির্বাচিত অংশ)